# অবৈধ অস্ত্রের নেটওয়ার্ক

**শুধু অবৈধ অস্ত্র নয়, বৈধ অস্ত্র দিয়েও প্রতিদিন খুন হচ্ছে মানুষ। চিহ্নিত সন্ত্রাসী হত্যা মামলার আসামীরও রয়েছে বৈধ অস্ত্রের লাইসেন্স। যেমন ফেনির জয়নাল হাজারীর ক্যাডারদের মধ্যে কমপক্ষে ত্রিশ জনের রয়েছে অস্ত্রের লাইসেন্স। এদের প্রায় সবার নামেই রয়েছে একাধিক হত্যা মামলা... লিখেছেন ফরিদ আহমেদ**

১. সন্ধ্যাবেলা বাবুল মুগদাপাড়া বড় মসজিদের কাছের একটা দোকান থেকে সিগারেট কিনে মোড়ে দাঁড়িয়ে ফুঁকছিল। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল প্রায় একই বয়েসী বিবেক। বাবুল ক্লাস নাইন-এর ছাত্র (এক বছর ফেল করে) আর বিবেক ক্লাস টেন-এর। কিছুটা গিয়ে আবার ফিরে আসলো বিবেক। কষে একটা চড় লাগালো বাবুলের গালে। 'বেয়াদপ, বড় ভাইদের সামনে সিগারেট খাস'।

'আমি কি তোর বাপের টাকায় সিগারেট খাই? 'পাল্টা প্রশ্ন বাবুলের। লোক জড়ো হয়ে যায় রাস্তায়। দুজনকে ছাড়িয়ে দেয় কিছু মুরব্বীস্থানীয় ব্যক্তি। ঘন্টা দু'য়েকের ভেতরেই ঘটে গেল লঙ্কা কান্ড। থাপ্পড়ের প্রতিশোধ নিতে বাবুল চলে গিয়েছিল সায়েদাবাদে 'মাল' আনতে। ইতিমধ্যে তার দু'একজন বন্ধুকেও জানিয়ে রেখেছে 'রাইত দশটার মধ্যেই বিবেক্যারে সাইজ' করতে হবে।'

রাত সাড়ে নয়টা- দশটার দিকে পয়েন্ট টু টু বোরের পিস্তলের গুলি আর ২টা ককটেল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দোকানের ঝাপ পড়ে গেল। ককটেলের ভেতরের পাথর, কাঁচের টুকরো আহত করলো ৮-১০ জন নিরীহ পথচারীকে। নির্মমভাবে খুর দিয়ে পেঁচানো হলো বিবেককে। ছোট্ট পিস্তলটির গুলিতে বাম পা'টিকে অচল করে দিল।

বিবেক এখনো বেঁচে আছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। এসএসসি পরীক্ষা দেয়া হয়নি আর।

২. এই মাত্র কিছুদিন আগে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এইচবিএম ইকবালের দু'পাশ থেকে অস্ত্রধারীরা নির্বিচারে গুলি চালালো বিরোধী দলের মিছিলের ওপর। বিএনপি'র কোনো সন্ত্রাসী ঐ যুদ্ধে মরেনি। মরেছে সাধারণ ৩ জন মানুষ যাদের আওয়ামী লীগ বিএনপি দু'দলই নিজেদের বলে দাবি করেছে। ইকবাল এমপির দু'পাশ থেকে এলএমজি, এসএমজি, মর্টার, কামান, রকেট লাঞ্চার কিছুই ব্যবহৃত হয়নি। হয়েছে ক্ষুদ্র নাইন এমএম পিস্তল, পয়েন্ট থ্রিএইট বোরের পিস্তল আর কাটা রাইফেল।

বাংলাদেশে এখন যুদ্ধাবস্থা চলছে না। হচ্ছে না যেমন গৃহযুদ্ধ। তারপরও সারা দেশে প্রতি মাসে খুন হচ্ছে তিনশ', খোদ ঢাকা শহরে খুন হচ্ছে গড়ে প্রতি মাসে নয়জন। আর এই খুনের অধিকাংশই হয় প্রায় পুরো অংশ ক্ষুদ্রাস্ত্র দিয়ে হচ্ছে।

পত্রিকায় বড় বড় রিপোর্ট হচ্ছে। তা দিয়ে ক্ষুরধার লেখনীর সম্পাদকীয় লেখা হচ্ছে। মাঝে মাঝে এসব নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম হচ্ছে। যেই দেশ সেই দেশই থাকছে। প্রকৃত বিচারে এই অস্ত্রগুলো যে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করছে তা আমরা যেন বুঝতেই পারছি না।

প্রবাদে বলা হয় 'Small is Beautiful' অস্ত্রের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্ভবত এমন 'Small is Fearful' আকারে ছোট হলেও বেশ কিছু

## ক্ষুদ্র অস্ত্র সংক্রান্ত কনসালটেশনে প্রকাশিত তথ্য

সারা দেশে অবৈধ ক্ষুদ্র অস্ত্রের ব্যবহার ও বিস্তার ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। আশঙ্কা দেখা দিয়েছে শান্তি, নিরাপত্তা আর সামাজিক ভারসাম্য চরমভাবে বিঘ্নিত হওয়ার। এগিয়ে আসছে নির্বাচন। এই প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত তথ্যগুলো কতটা ভয়াবহ?

- সারা বিশ্বে ৫০ কোটি অবৈধ ক্ষুদ্র ও হালকা অস্ত্র রয়েছে।
- সারা বিশ্বে প্রায় ৭০টি দেশ বড়, মাঝারি কিংবা ছোট আকারের কারখানায় ক্ষুদ্র অস্ত্র উৎপাদন করছে।
- সারা বিশ্বে প্রতিবছর ৭ লাখ সাধারণ মানুষ ক্ষুদ্র অস্ত্রের ব্যবহারে নিহত হচ্ছে।
- পার্শ্ববর্তী দেশে অবৈধ অস্ত্রের চাহিদা এবং অস্ত্র-মাদকদ্রব্যের সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশ অস্ত্র ও মাদক পাচারের রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- অভ্যন্তরীণভাবে সারা দেশে ৮০টি সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট রয়েছে এবং এর মধ্যে ২৮টিই ঢাকাকেন্দ্রিক।
- সারা দেশে ২ লাখ অবৈধ অস্ত্র রয়েছে যার মধ্যে ৫০ হাজারই ঢাকা শহরে।
- প্রতিদিন দেশে নয়জন নিহত হয় এবং এদের মধ্যে চারজন অবৈধ অস্ত্রের শিকার।
- আসন্ন নির্বাচনে অবৈধ অস্ত্র নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অবৈধ অস্ত্রের বিস্তার ঘটছে।
- ছয় থেকে সাতশ' অবৈধ অস্ত্র ভারত থেকে আসে।

## বিস্ আয়োজিত ক্ষুদ্রাস্ত্র বিষয়ক কন্সালটেশন ও হিটম্যান

দিনব্যাপী কনসালটেশনের অধিবেশনে নায়লা হোসেনের প্রবন্ধ 'দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষুদ্র অস্ত্রের হুমকিসমূহ' উপস্থাপনের পর আলোচনায় উঠে আসে 'হিটম্যান'। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এমদাদুল হক রাজনৈতিক হাতিয়ার 'হিটম্যান'-এর ওপর সাপ্তাহিক ২০০০-এর একটি কপি তুলে ধরে আলোচনায় টেনে আনেন বিষয়টি। তিনি অর্থ, মাদকদ্রব্য এবং যুদ্ধ ও সংঘাতের প্রেক্ষাপটে হিটম্যান ও তাদের ক্ষুদ্র অস্ত্রের টার্গেট সাধারণ মানুষের অসহায় অবস্থার প্রেক্ষাপট নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তাঁর মতে, ক্ষুদ্র অস্ত্রের বিস্তারে বড় বড় অস্ত্র রপ্তানিকারকদের ভূমিকাকে মুখ্য বলে অভিহিত করেন। 'সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই প্রতিবেদন আমাদের সমাজে অস্ত্র ব্যবহারের মাত্রা ও ক্ষেত্রের দুরবস্থার কথা প্রমাণ করে। আর এ কারণেই আমাদের উচিত একটি সুসমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা'— অধ্যাপক এমদাদুল বললেন।

সুবিধার কারণে ছোট অস্ত্র সন্ত্রাসী ক্যাডারদের অতি প্রিয়। আকারে ছোট এবং ওজন কম হওয়ায় খুব সহজেই এই অস্ত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আর ব্যবহার করা আরো সহজ। প্রতিনিয়ত নাটক কিংবা সিনেমায় ক্ষুদ্র অস্ত্রের ব্যবহার আমাদের মানস-পটে এনে দিয়েছে অস্ত্র পরিচালনার কৌশল। অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় সংবেদনশীল অস্ত্রের তুলনায় ক্ষুদ্র অস্ত্রের দাম অনেকটাই আয়ত্তে হওয়ায় এর বিস্তৃতি ঘটেছে। উপরন্তু কিছু ছোট অস্ত্র স্থানীয়ভাবে অনুকরণ করে তৈরি করা যায়।

ইতিপূর্বে সাপ্তাহিক ২০০০ অবৈধ অস্ত্র, অবৈধ অস্ত্রের উৎস, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহারকারী হিটম্যান, অস্ত্রের শাসন ইত্যাদি নিয়ে একাধিক অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন লিখেছে। দৈনিক পত্রিকাগুলোও লিখছে। উত্তপ্ত রাজপথ আর উত্তপ্ত রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে অবৈধ অস্ত্রের দখলে। রাজনৈতিক সংলাপ আর বিতর্কের বদলে মুখোমুখি অবৈধ অস্ত্র। অবৈধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এইসব অস্ত্রের উল্লাসে জনগণ বোধহীন এবং শঙ্কিত। তবে আশার কথা এই যে, অবৈধ ক্ষুদ্র ও হালকা অস্ত্র সম্পর্কে কী করণীয় তা নিয়ে দেশের কিছু কিছু গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ভাবছে। আগামী জুলাইতে জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য ক্ষুদ্রাস্ত্র বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনকে সামনে রেখে সম্প্রতি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্টাটেজিক স্টাডিজ (বিস্) এবং বেসরকারি সংগঠন সাউথ এশিয়া পার্টনারশিপ-এর যৌথ উদ্যোগে এবং কানাডার পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক বিভাগের অর্থায়নে ঢাকায় হয়ে গেল দিনব্যাপী এক কনসালটেশন। সারা দিনের আলোচনায় বের হয়ে আসে সব চমকপ্রদ তথ্য। দিনব্যাপী আলোচনায় অংশগ্রহণকারী গবেষক, শিক্ষক, উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি, বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিরা যেআইনি অস্ত্রের বিস্তার রোধের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা-গুলোকে আহবান জানায়। তিনটি কর্ম-অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকায় নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনের কর্মকর্তা ড. ডন হিউবার্ট, বিস্-এর সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার সাহেদুল আনাম খান এবং বিস্-এর গবেষণা কর্মকর্তা নায়লা হোসেন। ড. হিউবার্ট বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, নায়লা হোসেন দক্ষিণ এশিয়া প্রেক্ষাপটে এবং ব্রিগেডিয়ার আনাম বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে তাদের প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ডন হিউমার্ট তার প্রবন্ধে বলেন, অবৈধ অস্ত্রই সারা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। আশির দশক থেকে ক্ষুদ্র অস্ত্রের যে বিস্তার শুরু হয়, স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তা সর্বকালের রেকর্ড ভেঙেছে। ইরাকের কুয়েত দখলের পর মধ্যপ্রাচ্যে ভারী ও ক্ষুদ্র অস্ত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয় ও আঞ্চলিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি উল্লেখ করেন, সরকারকে জাতীয়ভাবে যেমন পদক্ষেপ নিতে হবে তেমনি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে অবৈধ অস্ত্রের পাচার বন্ধে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে।

আমাদের প্রশ্ন হলো, শুধু ঐকমত্যে পৌঁছালেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

### দক্ষিণ এশীয় প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র অস্ত্রের বিস্তৃতি

দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র অস্ত্রের সমস্যাটিকে রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এবং এ ক্ষেত্রে মানবীয় বিষয়টি একেবারেই বিবেচনায় আনা হয় না। সমস্যাটি যতটা না রাজনৈতিক তার চেয়ে বেশি মানবিকতার বিরদ্ধে। আর তাই সমস্যার সমাধান কখনোই সম্ভব হবে না যদি বিষয়টিকে শুধু দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হয়। এই মত বিস্-এর গবেষক নায়লা হোসেনের। দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষুদ্র ও হালকা অস্ত্রের বিস্তৃতির প্রকৃতি ও মাত্রা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি অস্ত্রের চাহিদা ও যোগানোর হিসাবে, অস্ত্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মাদক, অপরাধ, রাজনীতি এবং ব্যবসায়িক লাভের গভীর সংযোগের কথা উল্লেখ করেছেন।

অস্ত্রের সঙ্গে উপরোক্ত বিষয়গুলোর গভীর সম্পর্ক অস্ত্র সরবরাহকারীদের চোখ এড়ায়নি। এক সময় ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা অবৈধ অস্ত্রের সর্বশেষ ব্যবহারকারী তথা এই তিনটি দেশে বাংলাদেশ ও নেপাল হয়ে অস্ত্র পৌঁছাতো। সাপ্তাহিক ২০০০-এর (১ম বর্ষ-৪১ সংখ্যা) ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ অবৈধ অস্ত্রের উৎস' শীর্ষক অনুসন্ধানমূলক প্রচ্ছদ কাহিনীতে প্রতিবেদক গোলাম মোর্তোজা লিখেছিলেন, 'বিশ্বের অস্ত্র ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশকে আসলে একটি ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করছে। এই অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে আবার কৌশলগত কূটনৈতিক কারণে জড়িত হয়ে পড়ে বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো।' ১৯৯৮ সালে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর কারসাজিতে বার্মায় পাঠানো অবৈধ অস্ত্রের চালান এবং ভারতীয় নৌ, বিমান ও স্থল সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর পরিচালিত 'অপারেশন লিচ'-এর প্রসঙ্গ টেনে তিনি লিখেছেন, 'এই অস্ত্র পাচারের কাজে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয় টেকনাফ-কক্সবাজার-চট্টগ্রাম। এই সময়ই বিভিন্ন হাত ঘুরে কিছু অস্ত্র ঢুকে যায় বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রয়োজনে। রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে জামাত শিবিরের হাতে চলে যায় কিছু। আর কিছু চট্টগ্রাম হয়ে সমুদ্র-পথে সুন্দরবনের মংলা হয়ে চলে যায় খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়ার চরমপন্থী দলগুলোর হাতে।'

এক সময় রুট হিসেবে ব্যবহৃত হলেও বালাদেশ এখন শুধুমাত্র রুট নয়। নায়লা হোসেনের মতে, বর্তমানে অস্ত্র ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশেও অস্ত্রের নতুন বাজার খুঁজে পেয়েছে। সংঘাতপ্রবণ সমাজে অস্ত্রের প্রয়োজনীয় সহজবোধ্য হলেও ব্যাপক মাত্রায় সংঘাতবিহীন সমাজে অবৈধ অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝা কঠিন। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি বাহিনীর সঙ্গে সহিংসতার সময়ে অস্ত্রের যে বিস্তার প্রত্যক্ষ করেছিল বর্তমানে 'শান্তির সময়ে' তা একটুও কমেনি। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, নাসির বাহিনী— এইসব নামগুলো পত্রিকার পাতায় যেভাবে আসছে তা কিন্তু এ কথাই প্রমাণ করে। 'স্বাধীনতা যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ছোট অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ছিল মূলত রাজনৈতিক ও আদর্শের প্রয়োজনে। সেই প্রয়োজন আজ ঘুরে গেছে ক্ষমতা ও টাকার দিকে। আজ পার্টি

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও একটি অপরাধ-প্রবণতার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা কঠিন' বললেন, বিবেচক নায়লা হোসেন।

দক্ষিণ এশিয়ায় অস্ত্রের উৎস প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে, 'দক্ষিণ এশিয়ার ছোট ও হালকা অস্ত্রগুলোর বেশির ভাগই আফগান যুদ্ধের অবশিষ্টাংশ'। দক্ষিণ এশীয় দুই অস্ত্রবিষয়ক বিশেষজ্ঞ ভারতের কার্থা এবং পাকিস্তানের আয়েশা সিদ্দিকা আশাদ্বয়ের যৌথ নিবন্ধের উদ্ধৃতি, উল্লেখ করে নায়লা হোসেন বলেন, 'আফগান থেকে কমপক্ষে ৩০ লক্ষ কালাশনিকভ্ কাশ্মীরে চলে গেছে... এসব অস্ত্রের একটা অংশ বাংলাদেশ ও নেপালের বাজারেও প্রবেশ করেছে।'

এই প্রসঙ্গে গোলাম মোর্তোজা লিখেছিলেন, 'চীন-মায়ানমার হয়ে প্রচুর চাইনিজ অস্ত্র আসে টেকনাফে। ক্যারেন বিদ্রোহীদের মাধ্যমে এই অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রোহিঙ্গারা। থাইল্যান্ডের ক্যারেন গেরিলাদের অস্ত্রও এই রুটে আসে। এই অস্ত্রেরও একটি অংশ সমুদ্রপথে খুলনা, যশোর অঞ্চলের চরমপন্থী গ্রুপগুলোর হাতে এসে পৌছায়। অর্থাৎ বে অব বেঙ্গল এখন তামিল, বর্মি, আসামী, নাগা ও বাংলাদেশীদের অস্ত্র কেনাবেচার নিরাপদ হাট।

পাকিস্তান-আফগান যুদ্ধের সময়, বিশেষ করে '৮০'র দশক থেকে অস্ত্র ও ড্রাগ বাজারে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা ভারতের বিভিন্ন উগ্র স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলোকে নিয়মিত অস্ত্র সরবরাহ করে আসছে। বিশেষ করে পাঞ্জাবের শিখ এবং কাশ্মীরের মুজাহিদদের সঙ্গে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার রয়েছে রমরমা অস্ত্রের ব্যবসা। সরকারিভাবে শুধু নয়– পশ্চিম ভারতে অস্ত্রধারীদের অস্ত্র শপিং হয় পাকিস্তানেই। আফগানিস্তান সোভিয়েত দখলে থাকাকালীন যুক্তরাষ্ট্র বিপুল পরিমাণ অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করতো বিদ্রোহী আফগানদের। আমেরিকা এই অস্ত্র আফগানদের দিত পাকিস্তানের মাধ্যমে। আর পাকিস্তান সেই অস্ত্রের একটি অংশ সাপ্লাই দিত ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সশস্ত্র চরমপন্থী দলগুলোকে। আর পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা এই অস্ত্রের একটি অংশ আবার তুলে দিত বাংলাদেশের জামাত-শিবিরের হাতে। জামাতিদের কাছ থেকে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে এই অস্ত্র কিনে নেয় বিভিন্ন চরমপন্থি সশস্ত্র দলগুলো। উগ্র মৌলবাদী অনেক সংগঠনের জন্ম মূলত অস্ত্র ব্যবসার মাধ্যমে। পাশাপাশি জামাত-শিবিরের ক্যাডাররা তো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শক্তিশালী হয়েছেই। ভৌগোলিক কারণে পাকিস্তান সীমান্ত এবং আফগানিস্তানে উৎপন্ন হয় বিপুল পরিমাণ মাদক-আফিম। এই আফিম বিক্রি করে আফগানরা আয় করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার। এ কারণে সারা বিশ্বের অস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বর্গরাজ্য আফ-গানিস্তান ভায়া পাকিস্তান। ফলে সিআইএ'র অস্ত্র সরবরাহ কমলেও তালেবানদের অস্ত্রের ঘাটতি পড়েনি। তারা বিশ্বের আধুনিকতম অস্ত্র প্রতিনিয়তই ক্রয় করছে অস্ত্র ব্যবাসয়ীদের কাছ থেকে। এই আফগান তালেবানদের কিছু অস্ত্রও পাকিস্তান বাজার থেকে চলে আসছে বাংলাদেশে। ধারণা করা হয়, বিভিন্ন সময়ে চট্টগ্রামের শিবির ক্যাডারদের কাছ থেকে আটককৃত রকেট লাঞ্চার, একে-৪৭, রাইফেল তালেবানদের মাধ্যমেই বাংলাদেশে এসেছে।'

যদিও বেশির ভাগ দ্বন্দ্ব-সংঘাতগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই বেশি হয়ে থাকে, তথাপি ঐ দ্বন্দ্ব-সংঘাত পালে হাওয়া পাওয়া উন্নত বিশ্ব তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, চায়না, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, চেকোশ্লোভাকিয়া, ইসরায়েল, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সুইজারল্যান্ড এবং যুগোশ্লাভিয়া। এছাড়াও উন্নয়শীল দেশগুলোর সরকারি অস্ত্রাগারের করুণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী, ট্রান্সন্যাশনাল অপরাধীচক্র এবং অভ্যন্তরীণভাবে তৈরির কারখানা ক্ষুদ্র ও হালকা অস্ত্রের বড় উৎস।

উৎস যাই হোক না কেন, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোতে এখন অস্ত্র খাদ্য-বস্ত্রের মতই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যদিও এই অস্ত্রের পরিমাণ বাংলাদেশের তুলনায় ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় ঢের বেশি, অনেকগুলো কারণে অস্ত্রের এই বিস্তার বর্তমান প্রেক্ষাপটে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মতো আমাদের দেশে জাতিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে না। আমাদের সমাজের সন্ত্রাস, সংঘর্ষই অবৈধ অস্ত্রের চাহিদাকে তীব্রভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এখানকার সংঘর্ষগুলোর প্রকৃতিই বলে দেয় আমরা কতই অসহনশীল জাতিতে পরিণত হয়েছি। বয়সে বড়দের সামনে সিগারেট খাওয়াকে কেন্দ্র করে বিবেকের করুণ পরিণতি কিংবা ক্রিকেট খেলার মতভেদ গড়াচ্ছে রক্তাক্ত সংঘর্ষে। আর এ ক্ষেত্রে ত্রাতা হিসেবে আছে ক্ষুদ্র অস্ত্র। দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের চাহিদা বর্তমানে বেড়ে গেছে আর একে- ৪৭, জার্মানিতে তৈরি রিভলবার, ফাইভ স্টার, এম সিক্সটিন নাইন শুটার, শটগান ইত্যাদির সহজলভ্যতা ঐ চাহিদাকে উস্কে দিচ্ছে।

দিন দিন অস্ত্রের বিস্তার এমন সব স্বার্থবাদীদের কব্জায় চলে যাচ্ছে যে, তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সবচেয়ে বিপদের কথা এই যে, সাপ্তাহিক ২০০০-এর অস্ত্র সংক্রান্ত ইতি-পূর্বেকার প্রতিবেদনগুলোতে যেসব দেশীয় ও আঞ্চলিক নেটওয়ার্কগুলোর কথা বলা হয়েছে বিস্-এর আলোচনায় সেগুলোর আন্তঃ-সম্পর্কে বলা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন নেটওয়ার্কগুলো একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নেটওয়ার্কগুলোকে আঞ্চলিক-তার মাত্রা যোগ করেছে। তিনি মন্তব্য করেন, 'আমাদের দেশে ডেমোক্রেসির সঙ্গে মাস্তানো-ক্রেসি ডেভেলপ করেছে আর অপরদিকে সিভিল সোসাইটি বিভক্ত হয়ে পড়েছে।'

## ক্ষুদ্র অস্ত্র সংক্রান্ত জাতিসংঘ সম্মেলন ২০০১

পৃথিবীর প্রতিটি দেশে ক্ষুদ্র অস্ত্রের ব্যাপক বিস্তৃতি ও সহজলভ্যতা প্রতিটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তার প্রতি সৃষ্টি করেছে এক বড় হুমকি। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কোনো অঞ্চলই এই রাহু থেকে মুক্ত নয়। দক্ষিণ এশিয়ায়ও এই মাত্রা দিন দিন বাড়ছেই। বৈশ্বিক এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ আগামী জুলাই মাসে জেনেভায় আয়োজন করেছে 'The UN Conference on the Illicit Trade in small Arms in API its Aspects'. যেখানে বিশ্বের প্রতিটি দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে এই বিষয়ে দৈনিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করবেন। এই প্রেক্ষাপটে দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচ রাজধানী– ঢাকা, কলম্বো, দিল্লি, ইসলামাবাদ ও কাঠমন্ডুতে একদিনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে ঢাকায় নির্ধারিত সম্মেলনটি বিস্ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় ১২ ফেব্রুয়ারি। ক্ষুদ্রাস্ত্র বিষয়ক জাতিসংঘ ২০০১ সম্মেলন একটি 'আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা' ঘোষণা করবে এবং এ কারণেই মূলত জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায় থেকে সমস্যার ধারাবাহিকতা তুলে আনতে চাইছে। ক্ষুদ্র অস্ত্রের সমস্যা কোনো দেশের একক সমস্যা নয় এবং এটি গভীরভাবে যে কোনো দেশের আঞ্চলিক অবস্থানের ওপর বড় মাত্রায় নির্ভরশীল। অবৈধ অস্ত্রের বিস্তার প্রতিরোধ, গ্রহণযোগ্য আন্তর্জাতিক নীতি প্রণয়ন, সংঘাতপ্রবণ অঞ্চলে অস্ত্রের বিস্তার রোধ, ক্ষুদ্রাস্ত্র বিষয়ে রাজনৈতিক ইচ্ছাকে গতিশীল করা এবং সকল পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টি এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

## শুধুই কী অর্থহীন প্রস্তাব

অস্ত্রের কারণে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এখন তা কারোরই অজানা নয়। বিস্-এর আলোচনায় উঠে এসেছে অসংখ্য প্রস্তাব। গবেষক, শিক্ষক উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি সবাই প্রকাশ্যে বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনীতিতে অস্ত্রের চর্চা না করার আহবান জানানো হয়েছে। সচেতনতা সৃষ্টিতে মিডিয়ার ভূমিকার প্রশংসা হয়েছে। অস্ত্রের বিস্তার রোধে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষিত বেকার সমস্যা দূরীকরণ, অস্ত্র বিস্তারে শিশু ও নারীদের ব্যবহার রোধ, অস্ত্র আমদানি কিংবা পাচারে সুসমন্বিত তথ্য ব্যাংক গঠন, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইস্যু আলোচনা, বৈধ আমদানির নামে অবৈধ অস্ত্র আমদানি, ধৃত অস্ত্র পুনরায় সন্ত্রাসীদের হাতে চলে যাওয়া রোধ, শুটিং চর্চার গভীর পর্যবেক্ষণ, মাদক, মানুষ পাচার ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে অস্ত্রের বিষয়টির সংযোগ স্থানে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুসমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

### ক্ষুদ্র অস্ত্রের বিস্তার : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে রকেট লাঞ্চার, কামান, ট্যাঙ্ক, স্কাড, ক্রুজ কিংবা ল্যান্ড মাইনে কেউ আহত কিংবা নিহত হয় না। ক্ষুদ্র ও হালকা অস্ত্রের দোর্দন্ড প্রতাপ ঐ সব ভয়ংকর মারণাস্ত্রের চেয়ে যেন আরো ভয়ংকর। খেলনা পিস্তল দেখিয়ে দিনে-দুপুরে লাখ লাখ টাকা যে দেশে ছিনতাই হয় সে দেশে আসলে বড় কিংবা ভারী অস্ত্রের কি প্রয়োজন? এর প্রভাব যে শুধুই শারীরিক তা নয়, মানসিক এবং সামাজিকও বটে। আর এ কারণে এই প্রভাবের দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল আরো ভয়াবহ।

কিন্তু অবৈধ ক্ষুদ্র অস্ত্রের প্রেক্ষাপট দক্ষিণ এশীয় অন্যান্য দেশ এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একরকম নয়। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে অস্ত্রের উৎপাদন, পাচার সবই ব্যাপক মাত্রায় এবং সুসংগঠিতভাবে হয়। এসব দেশের অস্ত্রের প্রয়োজন, আকার, ওজনের মাপকাঠিও ভিন্ন। আর তাই বাংলাদেশের সমস্যাকে চরিত্রায়ণ করা যেতে পারে ছোট এবং স্থানীয় অস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে। আর এদের ব্যবহার মূলত রাজনৈতিক, আধিপত্য বিস্তার, অর্থ-উপার্জন এবং ক্ষমতা। এর বাইরে যে কারণ বিদ্যমান তা সম্পূর্ণ সামাজিক, যদিও উপরোক্ত কারণগুলোও সমাজবহির্ভূত নয়।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে অস্ত্রের আগমন ষাটের দশকে আইয়ুব খানের অনুচরদের মাধ্যমে। তবে এটা চরম আকার ধারণ করে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র দ্রুত জমা নেয়া হয়, কিন্তু জমা নেয়া হয়নি পাকিস্তানিদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রচুর সংখ্যক পলাতক রাজাকারের হাতে থেকে যায় অস্ত্র। তাছাড়া রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, অপ্রাপ্তি আর হতাশা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে চলে আসে বিভক্তি। কেউ কেউ অস্ত্র হাতে যোগ দেয় উগ্রবাদী রাজনীতিতে। কেউ হয় শক্তি প্রদর্শক। সমাজে বেড়ে যায় সস্তায় খুন রাহাজানি...। তবে শুধু মুক্তিযুদ্ধ নয়, বাংলাদেশে ভৌগোলিক অবস্থান এমন দুটি অঞ্চলের মধ্যে (Golden Crescent) এবং (Golden Triangle) যেখানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অস্ত্র ও মাদক সংস্কৃতিতেই যুক্ত হয়ে গেছে। এতদাঞ্চলে স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা, অস্ত্রের সহজলভ্যতা, সমাজের অপরাধায়ন বা ক্রিমিনালাইজেশন, আর্থ সামাজিক অবস্থা, অস্ত্র ও মাদকের আন্তঃসম্পর্ক এবং রাজনীতিবিদ ও অস্ত্ররাধীদের আন্তঃসেতু— এ সবই আজকের বাংলাদেশে তাদের স্ব স্ব অবস্থান থেকে অবদান রেখেছে।

বিস্ আয়োজিত দিনব্যাপী কনসালটেশনের অধিবেশনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে গিয়ে বিস্-এর সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার শাহেদুল আনাম খান উল্লেখ করেন, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রায়ণ এবং ক্যাম্পাসে ভায়োলেন্স অস্ত্র ব্যবহারের আরেক মাত্রা। ছাত্র রাজনীতি বাংলাদেশে নতুন নয় কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্র-রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে প্রকট হয়েছে। ফলে অস্ত্রনির্ভর ক্যাম্পাসে ভায়োলেন্স ও সন্ত্রাস বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতিতে অপরিহার্য সংস্কৃতি হয়ে গেছে।' জনাব আনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১৪ জন অস্ত্রধারী ক্যাডারের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপটে আমরা এখন ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। এক সময় ঢাকা শহরে ঢা.বি. কেন্দ্রিক মাস্তানি ও রাজনীতি ছিল। কোনো ক্যাডারই জগন্নাথ কলেজ কিংবা ঢা. বি.তে মাস্তানি কিংবা অস্ত্রবাজি না করে 'জাতে' উঠতে পারতো না। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেই সংস্কৃতির স্থান দখল করেছে 'মহল্লা কেন্দ্রিক মাস্তানি'। ঢা.বি.তে এখন ক্যাডারবাজির নামে 'ছ্যাছরামি' প্রচলিত। আর এ কারণেই পকেটে পিস্তল নিয়ে ঈদের আগে ক্যাম্পাস-পার্শ্ববর্তী মার্কেট থেকে চাঁদা তোলা, চাঁদা না পেয়ে কাঁটাবন মার্কেট থেকে কুকুর ও অন্যান্য জীবজন্তু নিয়ে আসা, শিক্ষা ভবনে মাস্তানি করতে গিয়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের হাতে শফিক-শিমুলদের বেধড়ক গণধোলাইয়ের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

ব্রিগেডিয়ার আনাম লিখেছেন, আমাদের সমাজ অস্ত্র নির্ভর হয়ে গেছে। তার দেয়া তথ্যে দেখা যায়, সারা দেশে রয়েছে ৮০টি অপরাধী সিন্ডিকেট যাদের ২৮টি ঢাকা শহরে। এসব অস্ত্রধারী গ্যাংগুলো চোরাকার-বারীদের সুরক্ষা দিচ্ছে। পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, সারা দেশে ২ লাখ অবৈধ অস্ত্র আছে যার ৫০ হাজারই ঢাকা শহরে। সাপ্তাহিক ২০০০ বর্ষ-৩, সংখ্যা ৪১, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১-এ প্রচ্ছদ কাহিনী করেছে 'অস্ত্রের শাসন' উঠে এসেছে অস্ত্রের মহড়ায় ডা: এইচবিএম ইকবাল, শামীম ওসমান, তাহের, হাজী মকবুল, মোফাজ্জল হোসেন মায়া ও তার পুত্র, জয়নাল হাজারী, হাজী সেলিম, মির্জা আব্বাস—এসব নাম। রিপোর্টে আগামী নির্বাচনে অস্ত্রের মহড়া নিয়ে জনগণের শংকার কথা বলা হয়। বিস্-এর আলোচনায় বেশ কয়েকজন বক্তা একই বিষয়ের পুনরুল্লেখ করেন।

ব্রিগেডিয়ার আনাম বলেন, রাজনৈতিক ও প্রফেশনাল সন্ত্রাসীদের আন্তঃসম্পর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই। সারা দেশে প্রতিদিন নয়টি হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় যার চারটি অবৈধ অস্ত্রের মাধ্যমে। প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ ব্যক্তি অবৈধ অস্ত্রের কারণে আহত হয়। পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন, প্রতিদিন সীমান্ত দিয়ে প্রায় একশ' অবৈধ অস্ত্র দেশে প্রবেশ করে এবং ছয় থেকে সাতশ' অবৈধ অস্ত্র ভারত এবং মায়ানমার থেকে আসে। পাশাপাশি দেশে ক্ষুদ্র ও হালকা অস্ত্র তৈরির কারখানা কারুশিল্পের আকার ধারণ করেছে এবং সারা দেশে এর সংখ্যা ৫০-এর কম নয়। আবার সরকারি মালখানা থেকে 'চুরি' যাওয়া অস্ত্র, শুটিং ফেডারেশন থেকে খোয়া যাওয়া অস্ত্র ও গুলি— সব মিলিয়ে অস্ত্রের যোগান ও চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক পর্যায়ে রেখেছে।

শুধু অবৈধ অস্ত্র নয়, বৈধ অস্ত্র দিয়েও প্রতিদিন খুন হচ্ছে মানুষ। চিহ্নিত সন্ত্রাসী হত্যা মামলার আসামীরও রয়েছে বৈধ অস্ত্রের লাইসেন্স। যেমন ফেনির জয়নাল হাজারীর ক্যাডারদের মধ্যে কমপক্ষে ত্রিশ জনের রয়েছে অস্ত্রের লাইসেন্স। এদের প্রায় সবার নামেই রয়েছে একাধিক হত্যা মামলা।

### শেষ কথা

মাও সেতুং বলেছিলেন, 'যুদ্ধ হচ্ছে রক্তপাতময় রাজনীতি, আর রাজনীতি হচ্ছে রক্তপাতহীন যুদ্ধ।' বাংলাদেশে এখন রক্তপাতহীন যুদ্ধ চলছে না, চলছে রক্তপাতময় রাজনীতি। এই রাজনীতির কোনো আদর্শ নেই, এখানে অস্ত্রই সব। রাজনীতির ভাষা অস্ত্র। যে কেউ, যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে এই অস্ত্রের শিকার। তাই তারা চায় নিরাপত্তা। এই রাষ্ট্র কি তাদের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম নয়?